সোমেন পালিতের উত্তররসূরি অনুসন্ধান

অণেশ ঘোষ

জুহু
সান্টাক্রুজ থেকে নেমে অপরাহে জুহুর সমুদ্রপারে গিয়ে
কিছুটা স্তব্ধতা ভিক্ষা করেছিলো সূর্যের নিকটে থেকে সোমেন পালিত ;
বাংলার থেকে এত দূরে এসে -- সমাজ , দর্শন, তত্ত্ব, বিজ্ঞান হারিয়ে,
প্রেমকেও যৌবনের কামাখ্যার দিকে ফেলে পশ্চিমের সমুদ্রের তীরে
ভেবেছিলো বালির উপর দিয়ে সাগরের লঘুচোখ কাঁকড়ার মতন শরীরে
ধবল আয়ুর দিকে -- নিকেল - ঘড়ির থেকে সূর্যের ঘড়ির কিনারায়
মিশে যায়। সেখানে শরীর তার নটকান-রক্তিম রৌদ্রের আড়ালে
অরেঞ্জস্কোয়াশ খাবো হয়তো বা, বোম্বায়ের 'চাইমস' টাকে
বাতাসের বেলুনে উড়িয়ে,
বর্তুল মাথায় সূর্য বালি ফেনা অবসর অনিমা ঢেলে,
হাতির হাওয়ার লুপ্ত কয়েতের মতো দেবে নিমেষে ফুরিয়ে
চিন্তার বুদ্‌বুদ্‌দের। পিঠের ওপার থেকে তবু এক আশ্চর্য সংগত
দেখা দিলো ; ঢেউ নয়, বালি নয়, ঊনপঞ্চাশ বায়ু, সূর্য নয় কিছু---
সেই কলরোলে তিন চার ধনু দূরে - দূরে এয়োরোড্রোমের কলরব
লক্ষ্য পেল অচিরেই -- কৌতূহলে হৃষ্ট সব সুর
দাঁড়ালো তাহাকে ঘিরে বৃষ মেষ বৃশ্চিকের মতন প্রচুর ;
সকলেই ঝিঁক চোখে -- কাঁধের উপর মাথা - পিছু
কোথাও দ্বিত্তি নেই মাথার ব্যথার কথা ভেবে।
নিজের মনের ভুলে কখন সে কলমকে খড়েগর চেয়ে
ব্যাপ্ত মনে করে নিয়ে লিখেছে ভূমিকা , বই সকলকে সম্বোধন ক'রে!
কখন সে বাজেট মিটিং, নারী, পার্টি-পলিটিক্স, মাংস মার্মালেড ছেড়ে
অবতার বরাহকে শ্রেষ্ঠ মনে করেছিলো;
টোমাটোর মতো লাল গাল নিয়ে শিশুদের ভিড়
কুকুরের উৎসাহ, ঘোড়ারসওয়ার, পার্শী, মেম, খোজা, বেদুইন,সমুদ্রের তীর,
জুহু, সূর্য, ফেনা বালি -- সান্টাক্রুজে সবচেয়ে পররতিময় আত্মক্রীড়
সে ছাড়া তবে কে আর ? যেন তার দুই গালে নিপম দাড়ির ভিতরে
দু'টো বৈবাহিক পেঁচা ত্রিভুবন আবিষ্কার ক'রে তবু ঘরে

ব'সে আছে; মুন্সী, সাভারকর, নরীম্যান তিন দৃষ্টিকোণ থেকে নেমে এসে
দেখে গেল মহিলারা মর্মরের স্বচ্ছ কৌতূহলভরে,
অব্যয় শিল্পীরা সব ঃ মেঘ না চাইতে এই জল ভালোবাসে।

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯)। জন্ম বাংলাদেশের বরিশালে। ১৯৫৫ সালে 'শ্রেষ্ঠ কবিতার'র জন্য পান মরণোত্তর অকাদেমি পুরস্কার। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ রূপসী বাংলা, ধূসর পাণ্ডুলিপি, বনলতা সেন, সাতটি তারার তিমির প্রভৃতি।

জুহু' কবিতারর নায়ক সোমেন পালিত।
আমরা আরও একজন নামহীন নায়কের কথা জানি, 'আট বছর আগের একদিন'--এ যে আত্মহত্যা করেছিল, জীবনের পরিণাম জেনে লাশকাটা ঘরকেই যার কাছে অপার শান্তির জায়গা মনে হয়েছিল।

এ বাদে, জীবনানন্দের আরও কয়েকজন যেমন, লোকেন বোস, সুবিনয় মুস্তফী, অনুপম ত্রিবেদীর কথা ও জীবন আমরা জানি -- এইসব নায়ক চরিত্রের মধ্যে জীবনানন্দের সত্তার বেশ কিছুটা অংশ যেমন ঢুকে পড়েছে, তেমনি বাইরের তাঁর দেখা-জানা-চেনা কোন না কোন মানুষের সত্তাও এসে মিলে মিশে গিয়েছে মনে হয়। এরা জীবনানন্দের সময়ের চলমান অথবা মৃত মানুষ হয়েও --- সেই সময়কে অতিক্রম করে আমাদের এই বিশৃঙ্খল সময়েও এসে জানালায় উঁকি দেয়, অন্দরে ঢুকে পড়ে।

অন্যদের চেয়ে সোমেন পালিতকে বেশি আকর্ষণীয় মনে হয় এজন্যে যে, জীবনানন্দের এই নায়ক চরিত্রটি শুধু একজন রক্তমাংসের মানুষই নয়, একটি কালের প্রতিবিম্বও বটে, যার বিশ্বাস ছিল কিন্তু এখন আর নেই আর সেই বিশ্বাস ছিল ভ্রান্ত --- তার নিজেরই মনের ভুলে। তবু তিনি আত্মহত্যা করেননি, আত্মহত্যা করেও সমস্যার সমাধান হবে না জেনে। তাঁর প্রাজ্ঞতা, রহস্যময়তা, অবতার বরাহকে অবশেষে ভবিতব্য বলে মেনে নেওয়া, দুই বৈবাহিক পেচকের তার দাড়ির জঙ্গলের ঘরে ফিরে আসা সত্ত্বেও, '...মহিলারা মর্মরের মত স্বচ্ছ কৌতূহল ভরে/ অব্যয় শিল্পীরা সব মেঘ না চাইতে এই জল ভালবাসে'--এতসব কাণ্ড আমাকে আলোড়িত ও মথিত করে। বই বন্ধ করে আমি চুপ করে বসে থাকি। ভাবতে চাই, ভাবতে পারি না। আমার দৃষ্টি প্রসারিত হয় সামনের শূন্যতায়। 'জুহু'র আগের কবিতাটির নাম 'সৃষ্টির তীরে'। দুটি কবিতা একই বছরে লেখা হয়েছে। সময়টা ১৩৫০। দুটি কবিতাই সাতটি তিমির কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত--'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'বনলতা সেন', 'মহাপৃথিবী'র পরে 'সাতটি তারার তিমির'--১৩৪৩ থেকে ১৩৫৫-- এই বারো বছরে অনেক বদলে গেছেন জীবনানন্দ, অনেকটা পথ অতিক্রম করেছেন তিনি, বলা চলে মভূমির একেবারে অভ্যন্তরে, মধ্য মভূমিতে এসে পৌঁছেছেন, যেখানে কোন মদ্যানের আশা করাবোকামি বরং উত্তরে-দক্ষিণে রাশ-রাশ মরীচিকাই প্রতিমুহূর্তে প্রলোভিত করে পথিককে। যে দু-একজন শৌখিনতা বশে তাঁর সহযাত্রী হয়েছিলেন, তাঁরাও জীবনানন্দকে পরিত্যাগ ক'রে ঘরে ফিরে গেছেন --কবিকেই দোষারোপ করতে করতে। জীবনানন্দকে কিন্তু সেই দুঃসহ রাত্রি হিম ম - বালির উপরই খাটিয়ে নিতে হয়েছে তাঁর নিজস্ব তাঁবু।

'জুহু' পড়বার আগে, পাঠক আসুন আমরা পড়ি, জীবনানন্দের সেই 'সৃষ্টির তীরে'র বিখ্যাত পংক্তিগুলি
'হরিণ খেয়েছে তার আমিষাশী শিকারীর হৃদয়কে ছিঁড়ে ' ;
অথবা

'বিলোচন গিয়েছিল বিবাহ ব্যাপারে
প্রেমিকেরা সারাদিন কাটায়েছে গণিকার বারে
সভাকবি দিয়ে গেছে বাক্‌বিভূতিকে গালাগাল'।

কিংবা

‘অযথা যেসব নাম ভালো লেগে গিয়েছিল আপিলা চাপিয়ে
---টি খেতে গিয়ে তারা ব্রেড বাস্কেট খেল শেষে।’

আর সবশেষে

‘তাজা ন্যাকড়ার ফালি সহসা ঢুকেছে নালি ঘায়ে।’

‘বিলোচন’ কিন্তু জন্মান্ধ নয় -- একদা তার চোখ ছিল, আজ তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সেই বিলোচন গিয়েছিল বিবাহের সম্বন্ধ করতে, দেখার চোখ নেই তবু সে পাত্রী পছন্দ করে এসেছে ---তার কথা মেনেই বরকে বিবাহ করতে হবে। পরিণামে যা হবার তাই হয়েছে, প্রেমিকেরা গোটা দিন --- (পুরোজীবন?) --- গণিকার বারে কাটিয়ে এসেছে। জীবনানন্দের ক্লেষ, জীবনানন্দের রূঢ়তা, জীবনানন্দের দ্বিধাহীন নঞর্থক সত্যের সন্ধান, তাঁর কাব্যজীবনের প্রায় শেষ দিকে এসে ঝলসে উঠল।

এই পর্যায়ের কবিতা পড়ে বুদ্ধদেব বসু বিস্মিত, আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। ‘মহাপৃথিবী’ আর ‘বনলতা সেন’ -এর কবির হাত দিয়ে এসব কী বেরোচ্ছে ? সঞ্জয় ভট্টাচার্যও দ্বিধাগ্রস্ত। জীবনানন্দের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ থাকে না, কোন সুপরামর্শ, কোন সৎনীতিবাক্য, তাকে ফেরাতে পারে না, কেউ যদি তার চোখের সামনে তুলে ধরে তার অতীতজীবনের নম্রতা ও সাফল্যকে, প্রেম ও প্রকৃতি চেতনাকে, তবুও না নির্দিষ্ট খুনটি তাকে করতেই হবে, জীবন তাকে যতভাবে যতরকম পদ্ধতিতে প্রতারিত করেছে তার প্রতি উত্তর নিষ্ঠুরতা ভিন্ন অন্য কোনভাবে দেওয়া যায় না। ডিলান টমাস শহর থেকে শহরে ঘু’রে অতিরিক্ত মদ্যপান ক’রে, মাত্রাধিক মদ্যপানের মধ্য দিয়েই নিজের অকাল মৃত্যুকেই ত্বরান্বিত করেছিলেন একটা সময়ে। আঁতোয়া আর্তো উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন জীবনের নিষ্ঠুরতার উৎসস্থলটি নির্ভয়ে খুঁজতে গিয়ে। জীবনানন্দ তাঁর ‘সাতটি তারার তিমিরে’ নিজের মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেও বিরত হননি সত্যানুসন্ধানে। বরং এই সময়েই ট্রামের চাকায়, অপঘাতে যে তাঁর রক্তমাংসময় খণ্ড জীবনের সমাপ্তি ঘটবে, তা যেন নির্দিষ্ট হয়ে যায়।
এই যখন মনোভাব জীবনানন্দের, তখনই লিখলেন ‘জুহু’। সৃষ্টি হল অদৃষ্টপূর্ব, নির্মম, পরিহাসময়, ‘পররতিময় আত্মক্রীড়’ এক নায়কের। সোমেন পালিতের। সোমেন পালিত বাংলার সেই সময়ের একজন লেখক, ইন্টেলেকচুয়াল, আঁভা-গার্দ লেখক, ঈষৎ বামপন্থীও কি ? --হ্যাঁ, তাই। আর ভি, আই, পিদের দলে সোমেনও একদা ছিল। বোঝা যায়
‘নিজের মনের ভুলে কখন যে কলমকে খড়্গের চেয়ে
ব্যাপ্ত মনে ক’রে নিয়ে লিখেছে ভূমিকা, বই সকলকে সম্বোধন করে।
কখন সে বাজেট - মিটিং, নারী পার্টি-পলিটিক্স, মাংস মার্মালেড ছেড়ে
অবতার বরাহকে শ্রেষ্ঠ মনে করেছিল ;’

অর্থাৎ বাজেট মিটিং, নারী, পার্টি -পলিটিক্স, মাংস ও মার্মালেড তার জীবনে ছিল, আর কলমকে খড়্গের চেয়ে ব্যাপ্ত বা তরবারির থেকে শানিত মনে হয়েছিল সেও নিজের মনের ভুলে, সেই আত্মতৃপ্তি, সেই ভুল বিশ্বাস থেকে এখন সে মুক্তি পেয়েছে কিন্তু ভুল বিশ্বাসের ক্ষত শুকোয়নি, শুধু জ্বলুনিটাই বেড়েছে। তাই এখন অবতার বরাহকেই সে শ্রেষ্ঠ মনে করে। এও বুঝেছে, বরাহকুলের শাসন - শোষণের বিস্তৃত জালে আটকা পড়া সেও এক শিকার মাত্র।
‘জুহু’ কবিতার প্রথম দুটো লাইন বয়ঃসন্ধিকালে প্রথম যখন পড়ি, চমকে উঠে স্থির হয়ে গিয়েছিলাম, দুটো পংক্তিকে মনে হয়েছিল পর পর দুবার বেত্রাঘাতের সমান
‘সান্টাক্রুজ থেকে নেনে অপরাহে জুহুর সমুদ্রপারে গিয়ে

কিছুটা স্তব্ধতা ভিক্ষা করেছিল সূর্যের নিকটে থেমে সোমেন পালিত ;

এভাবে যে কোন কবিতা সরাসরি সোজাসুজি শু হতে পারে তখনও আমার ধারণাতীত ছিল। বিশেষ করে রূপসী বাংলার পরম -মেদুর ও এলিয়ে পড়া কবিতাপ্রবাহ পড়ার পর, 'জুহু' --- আমি ভাবতে পারিনি। যাই হোক এই বেত্রাঘাতে আমি আরও বেশি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠি। আমার ভেতরের আড়ষ্টতা চুর্ণ হয়ে যায় মুহূর্তে।

বিস্মিত হয়ে লক্ষ করি, পুরো দুটো লাইনের মধ্যে কমা নেই, দম ফেলার সামান্য ফুরসৎ নেই, একেবারে শেষে আছে সেমিকোলন।

কে এই সোমেন পালিত ?
এই সোমেন পালিত সে-ই যে সমাজ , দর্শন, তত্ত্ব, বিজ্ঞান হারিয়ে, প্রেমকেও যৌবনের কামাখ্যার অর্থাৎ কামের দিকে ফেলে রেখে শেষবেলার প্রৌঢ় শরীর নিয়ে দূর বাংলা থেকে চলে এসেছে পশ্চিমে, আরব সাগরের তীরে। সূর্যের কাছে কিছুটা স্তব্ধতা ভিক্ষার জন্য। কেন ? -- না, যেখানে সে লঘুচোখ - কাঁকড়া হয়ে সমুদ্রের ধবল বাতাস খাবে সারাদিন।

এতক্ষণে আমরা কিছুটা হলেও সোমেন পালিতকে চিনতে পারি। সে রেনেসাঁস - পরবর্তী বাংলার তথা বাংলা উপন্যাসের এমন একজন আধুনিক নায়ক, যার শরীর ও সত্তা থেকে সব আদর্শবাদ, সব কৃত্রিমতা ঝরে গেছে যা যাচ্ছে। আর উপন্যাসটির নাম 'জুহু'। হ্যাঁ, উপন্যাস। জীবনানন্দের বেশ কিছু কবিতা রয়েছে যা উপন্যাস মনে করেও পাঠক পড়তে পারেন, আবার কবিতা হিসেবেও। 'জুহু' তার মধ্যে অন্যতম ও শ্রেষ্ঠ সোমেন পালিতের জন্য। সোমেন পালিতই বাংলা ভাষা তথা ভারতীয় সাহিত্যের প্রথম আধুনিক নায়ক, যে আন্তর্জাতিক মানের---যাকে জয়েসের পিওপোল্ড ব্লুম, কাফকার জোসেফ কে বা কাম্যুর মার্শেলের পাশাপাশি স্থান দেওয়া যায়।

পরবর্তী সময়ে আমি শশীর (পুতুল নাচের ইতিকথা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়) কথা অনেকবারই ভেবেছি. শশীও বাংলা উপন্যাসে ও বাঙালির প্রথম এক আন্তরিক আধুনিক নায়ক চরিত্র নিশ্চয়ই, কিন্তু তার গ্রামীণ কুহেলিকার জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা আর হল না, হতে পারল না । শশী গাওদিয়ায় থাকে তার নিয়তির পুতুল হয়ে। সে একই সঙ্গে কলকাতা - রোম - টোকিও - ন্যুইয়র্ক কেউ হতে পারেনি। তা হওয়ার ইচ্ছেও হয়ত তার ছিলনা। শশী সূর্যাস্ত দেখে, আতঙ্কিত হয়ে, মৃত্যুতাড়িত হয়ে --হাঁপাতে হাঁপাতে টিলার উপর থেকে নীচে নেমে এসেছিল। আর কোনদিন যে সূর্যাস্তের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে না, দাঁড়াতে পারবে না। গাওদিয়ার নতুন একজন মাতববর হয়ে সে তার জন্মদাতা গোপালের পাপস্খালন করতে করতে শেষ হয়ে যাবে। মৃত্যু হবে গাওদিয়াতেই তার। শশীকে সোমেন পালিতের পাশে বসানো যায় না। যদিও দুজনেই বাঙালি জীবনের ছোট ও গণ্ডিবদ্ধ আর বিশাল আন্তর্জাতিক পটভূমিতে সৃষ্টি এক অমোঘ ও অভূতপূর্ব ট্র্যাজেডির নায়ক। দুজনেই আধুনিক জীবনের অংশীদার।

সোমেন পালিত শুতেই সূর্যের কাছে এসেছে স্তব্ধতা ভিক্ষা করার জন্য আর শশী সূর্যাস্ত দেখে পালিয়ে যাচ্ছে তার গ্রামীণ সামন্ততান্ত্রিক নিত্তাপ আশ্রয়ে --- এই দুটি দৃশ্যের কথা যত ভাবতাম, ততই শিহরিত বোধ করতাম আমি সেই সদ্য যৌবনে যেমন আজও তাই বোধ করি।

'জুহু'র প্রথম ১২ লাইনের মধ্যে কোন দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ নেই, তা আছে তেরোতম পংক্তির মাঝখানে। 'সান্টুত্রুজ থেকে ... চিন্তার বুদ্‌বুদ্‌দের'--- একটা দীর্ঘতম যাত্রা, কমা - সেমিকোলন অবশ্য আছে তবু দম ফেলা যায় না, থামতে হয় সেই তেরোতম লাইনের মাঝখানে এসে। এই দীর্ঘমাত্রায় সোমেন পালিত প্রকাণ্ড মাংসল একটা পেঁয়াজের মতই নিজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে যেন বা এক শূন্যতার কাছাকাছি আসে। আর তখনই থেমে গেলেন কবি, দাঁড়িটানা হল না।

এরপর আরেকটি পর্যায় শু হল। এই পর্যায়ে কবিতার মধ্য শরীরটি যেমন রহস্যময় তেমনি সোমেন পালিতের চরিত্রের এই পর্বটিও। জীবনানন্দের প্রিয় শব্দটিরও দেখা পাই এখানে, শব্দটি হল 'তবু', 'তবু' শব্দটি প্রয়োগ করে জীবনানন্দ চূড়ান্ত নৈরাশ্য থেকে সজল আশার দিকে, অমানবিকতার থেকে মানবিকতার দিকে, নিষ্ঠুরতা থেকে দয়ার দিকে চলে যান অবলীলায়। এখানে 'তবু' কিন্তু ভিন্নমাত্রায়, 'পিঠের ওপার থেকে তবু এক আশর্চ্য সংগত দেখা দিল...'----জীবনানন্দ তাঁর নায়ককে বাস্তবতার ক্ষতা থেকে কিছুক্ষণের জন্য নিয়ে গেলেন রহস্যময়তার। 'জুহু'র সমুদ্রতীর থেকে সোমেন পালিতকে তুলে নিয়ে আসা হল এমন এক সৌর-পৃথিবীতে, যেখানে তাকে 'ঘিরে বৃষ মেষ বৃশ্চিকের মতন প্রচুর'।

'নিজের মনের ভুলে...
টোমাটোর মত লাল গাল নিয়ে শিশুদের ভিড়
কুকুরের উৎসাহ, ঘোড়ার সওয়ার, পার্শী, মেম, খোজা, বেদুইন, সমুদ্রের তীর,
জুহু, সূর্য, ফেনা, বালি --- সান্টাত্রুজে সবচেয়ে পররতিময় আত্মত্রীড়
সে ছাড়া তবে কে আর ?

মনে হয়, কবিতাটির বিস্তৃত মূল নাভিকেন্দ্রে এসে পৌঁছে গেছি আমরা। সোমেন পালিত কেনই বা 'জুহু'র সমুদ্রপারে কিছুট া স্তব্ধতা ভিক্ষা করতে গিয়েছিল -- সেই রহস্যের খানিকটা হলেও উদ্ধার করতে পারি যেন। নির্মমতার মুখোমুখি ক্লান্ত সে ামেন পালিত --- ভ্রান্ত সোমেন পালিত। কলমকে তরবারির চেয়ে ব্যাপ্ত মনে করার ভ্রান্তি তার কেটে গেছে, সে আর লিখবে না অন্যের বইয়ের বা নিজের গ্রন্থের 'যুক্তিনিষ্ঠ বোকা' ভূমিকা ; সকলকে সম্বোধন করে কোনউচচতর আদর্শকে সে আর তুলে ধরবে না। ভূল ভেঙে গেছে তার, আজ বরাহ - অবতারকেই শ্রেষ্ঠ মনে হয়। চারপাশে তো বরাহ - অবতাররের ভাবশিষ্যরাই উজ্জ্বল, উচছল, সহাস্য ব্যাদিত বদনে বিদ্রুপ আর ঘৃণা ছুঁড়ে দিচ্ছে সোমেন পালিতের মত মানুষদের বিদ্ধে। ...তবু এতসবের পরেও সোমেন পালিত সান্টাত্রুজ থেকে নেমে কিছুটা 'স্তব্ধতা' ভিক্ষা করে 'জুহু'র সমুদ্রপারের সূর্যের ক াছে, কেন?--- তখনই আমাদের হৃৎপিণ্ড ফুলে ওঠে, আমরা আকাশ - পাতাল কত কিছু ভাবি অভিভূত হয়ে।

'সাতটি তারার তিমিরে'র কবিতাগুচছ শু হওয়ার আগে থেকেই বিদ্রুপে, ঘৃণায়, বেদনায়, নিস্পৃহতায়, কাঠিন্যে, বিশৃঙ্খল ায়, অসংগতিতে ভরা প্রখর ঝিকে আত্মস্থ করে গিয়েছিলেন জীবনানন্দ। আর তা মথিত ক'রে, নিংড়ে উঠে আসে সোমেন পালিত। সোমেন পালিত সম্পূর্ণ হাল ছেড়ে দিয়েছে। হাল ছেড়ে না-দিলে, ঢেউয়ে ঢেউয়ে পুরো ছত্রখান না-হলে সত্যিক ারের সৃষ্টি হয় না, সত্যানুসন্ধানের পথে যাওয়া যায় না। হাল ছেড়ে দিলে মৃত্যুও অবধারিত হয়েযায় ---সে মৃত্যু হয় বেঘোরে, বিপথে, অগোচরে। একজন সৃষ্টিশীল মানুষ তা জানেন, তবু...। জানতেন জীবনানন্দ।

'...যেন তার দুই গালে নিপম দাড়ির ভিততে
দু'টো বৈবাহিক পেঁচা ত্রিভুবন আবিষ্কার ক'রে তবু ঘরে
বসে আছে ; মুন্সী, সাভারকর, নরীম্যান তিন দৃষ্টিকোণ থেকে নেমে এসে
দেখে গেল মহিলারা মর্মরের মতো স্বচ্ছ কৌতুহলভরে,
অব্যয় শিল্পীরা সব মেঘ না চাইতে এই জল ভালোবাসে।'

বস্তুত কবিতার শেষ পাঁচ লাইন উপসংহার বিশেষ। সোমেন পালিতের চিন্তা চেতনা কর্ম-কর্মফল সহ সমগ্র জীবনবে াধেরও উপসংহার। রহস্য আরও ঘনীভূত হয়, শরীরের শিহরণ বোধ হয় কবিতার শেষে এসে, সেই সঙ্গে পাঠকের ঠোঁটে একটি কণ হাসিও ফুটে ওঠে, এতঘৃণা এত বিদ্রূপ, এতটা পরিহাসের তথা সোমেন পালিতের পরিহাসময়জীবনের পরিশিষ্ট দেখে ও জেনে। সোমেন পালিত শুধু রক্তমাংসের একজন মানুষই নয়, রক্তমাংস - মাখা শুদ্ধ একটা সময়ের নামও।

আমরা ধরে নিয়েছি 'দুটো বৈবাহিক পেঁচা' র অর্থ দুজন বেয়াই মশাই। মার্কস ও ফ্রয়েড। এই দুই 'বৈবাহিক' এবং খণ্ডসময়ের সতর্কবার্তা বয়ে আনা 'পেঁচা'ও বটে -- যাঁরা ত্রিভুবন আবিষ্কার করার পরও নিজ নিজ নিরাপদ আশ্রয়েফিরে এসে বসে আছে। সে আশ্রয় আবার সোমেন পালিতের দাড়ির জঙ্গলের মধ্যে। পৃথিবীকে পালটাতে চেয়েছিলেন তাঁরা, প ারেননি, পৃথিবী তার আপন নিয়মে পাল্টায় অসফল। ব্যর্থ হতোদ্যম তাঁরা ঘরে ফিরে এসেছেন।

'বৈবাহিক' শব্দের দুটো অর্থ দেওয়া রয়েছে অভিধানে। এক বেয়াই বা বেহাই, দুই বিবাহে আগ্রহী বা বিবাহেচ্ছু। মনে হয় জীবনানন্দ দ্বিতীয় অর্থেই শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এক গালের দাড়ির জঙ্গলে মার্কসের অর্থনীতি, অন্যগালের দাড়িতে ফ্রয়েডের যৌন গূঢ়ৈষণা তথা যৌনতা। প্রথমজন যদি বর হন, দ্বিতীয়জন কনে --- যাদের মিলন কোনদিনও হবে না। অথচ দুজনেই চূড়ান্ত ভাবে ইচ্ছুক, মিলনে আগ্রহী। নিয়তি তাদের দুই ভিন্ন মেতে স্তব্ধ করে রেখেছে। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠপরিহাস এটাই, কণ ট্রাজেডিও বটে।

অবশ্য এইসবতত্ত্ব দর্শনের ঠাঁই নেই আর সোমেন পালিতের মাথার মধ্যে, মজা করে সে তার দাড়িতেই এদের আশ্রয় দিয়েছে। একদিন পেঁচারা দাড়ির এই নিরাপদ আশ্রয় ছেড়েও পালিয়ে যাবে দূরে -- মিলিয়ে যাবে, হারিয়ে যাবে একদিন। শতাব্দী শেষ হতে না হতেই তারা হারিয়ে গেল কোথায়।

মিগুয়েল দ্য সারভানতেসের ডন কুইকজোট থেকে জয়েসের লিওপোল্ড ব্লুম বা কাফকার যোশেফ কে অবধি যে অ াধুনিকতার ধারাত্রম তাতে বাংলা ভাষার আরেকটি নাম যুক্ত হল, সোমেন পালিত। আমি এখনও বাংলা সাহিত্য আর ব াঙালি জীবনে খুঁজি সোমেন পালিতের যথার্থ উত্তরসূরিকে। যার গালের দাড়িতে আজ আর মার্ক্স - ফ্রয়েডের কোন তত্বদর্শন থাকবে না, থাকবে নীট্‌শে ফুকো, দেরিদার ... দর্শনের মত অনেক চামউকুন, যথারীতি তারা ঝরেও যাবে। মিলিয়ে যাবে ঊর্ধ্বের আকাশ। মধ্যবর্তী সময়ে শুধু দাঁড়িয়ে থাকবে সোমেন পালিত বা তার উত্তরসূরি, নাপিতেরগামলা মাথায় যেমন ডন কুইকজোট !

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com